ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 196-203
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.196

প্রসঙ্গ কলকাতা ৭১: চলচ্চিত্র ভাষার নবনিরীক্ষা

ড. মোস্তাক আলি, *বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কালীগঞ্জ সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mrinal Sen (1923-2018) is a notable and iconoclastic filmmaker of the parallel stream of Indian cinema. Through his formal experiments, he brought about a revolutionary wave in Bengali cinema, which marked the beginning of a new chapter in its history. Such innovation is not seen in any of his predecessors, contemporaries, or successors among Bengali filmmakers. By infusing literary narratives with new ideas in the context of a new era, he reconstructed and reinterpreted those narratives to present his themes and concerns. Whether his films are based on literature or built on original screenplays, he has continually experimented with narrative and form.Although his first film released in 1955 ('Raat Bhore') up to 'Pratinidhi' (1964), he largely followed conventional forms or traditional modes of narration. But from the film 'Akash Kusum' (1965) onward he consciously moved away from tradition and opened up new possibilities in storytelling, creating a new cinematic language. Essentially, it was through the efforts of a few thinkers and filmmakers like him that the new wave in Indian cinema was born. His conviction is considerably reflected in the much-discussed film 'Kolkata 71' (1972).

Keywords: Parallel Cinema, Re-construction, Storytelling, Experiments, Iconoclastic, Conventional, Narrative

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমান্তরাল ধারার একজন ব্যতিক্রমী ও প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রই হোক বা মৌলিক চিত্রনাট্য আশ্রিত চলচ্চিত্র, প্রতিনিয়ত তিনি আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যদিও ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'রাতভোর' থেকে 'প্রতিনিধি' (১৯৬৪ খ্রি.) পর্যন্ত ছ'টি চলচ্চিত্রে তিনি আখ্যান বর্ণনায় প্রচলিত ফর্ম বা সনাতন রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু 'আকাশ কুসুম' (১৯৬৫ খ্রি.) চলচ্চিত্র থেকে তিনি সচেতনভাবে ঐতিহ্য থেকে সরে এসে আখ্যান বর্ণনায় অভিনবত্ব সঞ্চার করে নতুন সিনেমা ভাষার সৃষ্টি করেছেন। আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত নিটোল জমজমাট গল্প বর্ণনার পরিবর্তে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠোর সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখে ঐতিহ্যবাহী নান্দনিকতার ধারনাকে অস্বীকার করে মেইন স্ট্রীমের বাণিজ্যিক সিনেমার বিপরীতে এক ভিন্ন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। মূলত তাঁর মতো মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাত ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে নব তরঙ্গের সূচনা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র জমজমাট গল্প বা জনপ্রিয় আখ্যানকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্র নির্মিত হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, ন্যারেটিভ ছাড়াও কোনো একটি খবরের পাতার সম্পাদকীয় নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে। আলোচ্য 'কলকাতা ৭১'(১৯৭২ খ্রি.) চলচ্চিত্রেও তাঁর এই প্রত্যয়ী ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

কলকাতা ট্রিলজির অন্যতম এই চলচ্চিত্র-প্রবন্ধে পরিচালক মৃণাল সেন বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় ভারতবর্ষের অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থায় সহায়সম্বলহীন সর্বহারা শ্রেণির দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা ও তৎসঞ্জাত পরিবর্তমান পুঞ্জীভূত ক্রোধ, বিক্ষোভ ও সম্মিলিত প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য চলচ্চিত্রটি চার দশকের পাঁচটি আখ্যানের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম আখ্যানটি ১৯৭০ সালে আশীষ বর্মনের ছবির জন্য লেখা গল্পের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত 'ইন্টারভিউ' চলচ্চিত্র থেকে নিয়েছিলেন। শেষ আখ্যানটি তিনি ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যৌথভাবে রচনা করেছিলেন। এই চলচ্চিত্রের বাকি তিনটি আখ্যান যথাক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৩ খ্রি.), প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' (১৯৪৩) ও সমরেশ বসুর 'এস্‌মাল্‌গার' (১৯৫৩ খ্রি.)। চারটি দশকের চারটি দিনের মূল নির্যাসটিকে নিয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে একজন নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্যকারের মতো আমাদের ফেলে আসা ইতিহাসের সকরুণ দলিল উপস্থাপন করেছেন পরিচালক। প্রবহমান সমাজ ব্যবস্থায় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও সহায়সম্বলহীন শ্রেণির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং তাদের দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র দশক পর দশক ধরে একই থেকেছে। যুগ যুগ ধরে বয়ে চলা এই শোষণ ও বঞ্চনা পুঞ্জীভূত হতে হতে ক্রমে ক্রোধে রূপান্তরিত হয় এবং একসময় তা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ন্যায় ফেটে পড়ে।

'অতসী মামী' (১৯৩৫ খ্রি.) গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৩ খ্রি.) গল্পে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দারিদ্র্য দুর্দশার চাপে মৃত্যুর আগেই নিয়ত অপমৃত্যুতে আত্মহত্যার অধিকারকে অবদমিত করে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রামের আখ্যানে ব্রিটিশ-শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অখণ্ড বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় দারিদ্র্যে জর্জরিত এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে একদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও তার অনিবার্য পরিণতিতে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য ও বস্ত্র সংকট, অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে পূর্ব প্রতিশ্রুতি আদায়ে একের পর এক আন্দোলন ও ভীত-সন্ত্রস্ত কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের দমন-পীড়ন-শোষণে জাতির জীবনে নেমে আসে মহাবিপর্যয়, হতাশা ও নৈরাশ্য। এরই মাঝে নতুন একদল সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী শ্রেণি মহাযুদ্ধের আশীর্বাদে কালোবাজারি করে, ভবিষ্যতে অধিক মুনাফালোভে খাদ্য তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জমায়েত করে জিনিসপত্রের কৃত্রিম ঘাটতি বানিয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আশা, স্বপ্ন, আদর্শ ও মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। রূঢ় বাস্তবতার ঘা সহ্য করতে না পেরে নিষ্ঠুর সময়ের গ্লানি বুকে জীবন যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে অনেকেই আত্মহননের কঠিন পথে মুক্তির স্বাদ গায়ে মেখে কালের স্রোতে হারিয়ে যায়।

গল্পের শুরুতেই লেখক বেশ জোরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কালের আবহে নিম্নবিত্তের অসহায়তা তথা অস্তিত্বের সংকটে জীর্ণ সহায়সম্বলহীন এক দরিদ্র পরিবারের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যের চাপে ঘরের চালের সঙ্গে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে তাদের সমস্ত আশা ও স্বপ্ন। মানসম্ভ্রম বজায় রাখতে নারকেল ও তালপাতার আবরণে ঝাঁঝরা চাল মেরামতের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে মেঘভাঙা জল মাথায় নিয়ে নীলমণি, নিভা, শ্যামা ও নিমুরা কঠোর জীবন সংগ্রামে রত। তাদের কিছুই করার থাকে না, তারা নিষ্ঠুর সময়ের ক্রীড়নক মাত্র। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিভা স্বামীকে সরকারদের বাড়িতে যাবার কথা বললে নীলমণি ক্রোধান্ধ হয়ে স্ত্রীকে মারতে যায়। সময় ও সংসারের জাঁতাকলে পিষ্ট গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বউ নিভা রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ নালিশে শুধুই স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। অন্যদিকে, দরিদ্র পরিবারের কর্তা নীলমণির কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা ও অপরাধবোধে দগ্ধ হতে হতে বিবেকের দংশনে একসময় মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা 'শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন'। এক সুগভীর নৈরাশ্য গ্রাস করে তাকে এবং জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ খোঁজে, যদিও বাতাস রয়েছে তার অবাধ প্রাণধারণের। নিশ্বাস নিতে পারে অনায়াসে অথচ পেটের জ্বালা ও তীব্র অর্থাভাব তাকে বাধ্য করে আত্মহননের দিকে চালিত হতে। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষটি সমস্ত মান-অপমান বিসর্জন দিয়ে নিতান্তই বাধ্য হয়ে সরকারদের দালানে গিয়ে উপস্থিত হয়। জীবনের শত অপমান, লাঞ্ছনা ও গ্লানি সমস্তই নিমেষেই কোথায় হারিয়ে যায়। সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করে। সেখানে আর্থিক সংগতিসম্পন্ন অসুস্থ মানুষের মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা তার মনকে বদলে দেয়। আত্মহত্যার অধিকারকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে বাঁচার

অধিকার, মৃত্যু নয় জীবনই চিরন্তন সত্য। নীলমণির চোখ খুলে যায় সরকারবাড়ির আত্মীয় পিসেমশাইকে দেখে। সত্যই তো পৃথিবীতে এত বাতাস তাও পিসেমশাই-এর ফুসফুস ভরাতে পারে না—

> ''অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।''[১]

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'অঙ্গার' গল্পে লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তেতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষে অখণ্ড বাংলার বুকে যে অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল তার চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ দখলের লড়াইয়ে শক্তি প্রদর্শনের খেলায় মন্বন্তরের কবলে পড়ে বাংলার প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষ মারা যায়। বিজাতীয় শাসকের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, শোষণ ও পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডে দিশেহারা প্রাণ সর্বহারা বুভুক্ষু কাঙালের দল একমুঠো খাবারের প্রত্যাশায় কাতারে কাতারে নগর কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। মাঠের রাজা ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ বৃথা আশা ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু হয়ে শহরের রাস্তায় হাইড্রেনে ফুটপাথে ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবারে জীবন টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রামে লিপ্ত হয়। পেটের খিদে মেটাতে অনেকেই আদর্শ তথা নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে চোরাপথের বাঁকে নিজেদের মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যায়। লেখকের সুনিপুণ পর্যবেক্ষণে অতীতের মর্মান্তিক বেদনাগাথায় ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষের স্বরূপ, প্রকৃতি ও পরিণতি — ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় মূল্যবোধের অবক্ষয়ে প্রকটিত হয়েছে অস্তিত্বের সংকট।

দিল্লিতে কর্মরত এক প্রবাসী বাঙালি কথক নলিনাক্ষের স্মৃতিরোমন্থনে গল্পের শুরু। অবিভক্ত ভারতবর্ষের ফরিদপুরে সহায়সম্বলহীন নিম্নবিত্ত পরিবারে নলিনাক্ষ পিসিমা-পিসেমশাই, শোভনা, মীনু, নুটু ও হারুর সঙ্গে বাস করত। পিসেমশাই-এর ব্যবস্থাপনায় সে দিল্লিতে চাকরি পায়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও দরিদ্র নিম্নবিত্ত সুখী পরিবারটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে গভীর অন্ধকারে পতিত হয়। অর্থকষ্টে জর্জরিত বিধবা শোভনা দিল্লিবাসী মামাতো ভাই নলিনাক্ষের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করলে স্বর্গত পিসেমশাই-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় নলিনাক্ষ সেই মাসে পঁচিশ টাকা ও পরবর্তীকালে পনেরো টাকা করে মাসোহারা পাঠাতে থাকে। কিন্তু হঠাৎই একদিন মাসোহারার প্রদেয় মানি অর্ডার ফেরত আসে এবং জানা যায় শোভনারা সেখানে থাকে না।

প্রায় তিন বছর পর অফিসের কাজে নলিনাক্ষ বড়ো সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় আসে অফিসের তদ্বির-তদন্তের কাজে। নলিনাক্ষ ভাবে এই সুযোগে দু'দিন ছুটি নিয়ে ফরিদপুরে গিয়ে শোভনাদের খোঁজ নেবে। কর্মব্যস্ততায় হঠাৎই একদিন শিয়ালদহর বাজারে তার ছোটো পিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে দেখা হয়। নিষ্ঠুর কালপ্রবাহে সে জীবন সংগ্রামে রত—

> "কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন।"[২]

তার কাছে নলিনাক্ষ শোভনাদের বৌবাজারের তিনশো তেরোর এফ বাড়ির ঠিকানা পায়। অফিসের কাজ শেষ করে নলিনাক্ষ একদিন শোভনাদের বাসস্থান একটা মেসবাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়। তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় পিসতুতো বোন মীনুর সঙ্গে। পেটের আগুন নেভাতে ১২-১৩ বছরের কিশোরী মীনু আজ পতিতা। পিসিমার সাথে দেখা হলে পিসিমা খুশি হয় না, বরং পিসিমার কাছে সে নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একজন মানুষ। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে চরিত্রের স্বাভাবিক স্পন্দন যেন হারিয়ে গেছে। পিসিমার সঙ্গে কথোপকথনে নলিনাক্ষ জানতে পারে দারিদ্র্যের কারণে শোভনার ছেলেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিয়ে গেছে। অন্যদিকে মীনু ইজ্জত বিক্রি করে হরিশবাবুর দেওয়া আধুলি মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে—

> ''যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।''[৩]

প্রকাশ্যে বেহায়ার মতো এমন নির্লজ্জ ঘোষণায় মা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। যদিও পেটের জ্বালা মেটাতে মা নিজেই সন্তানকে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। শোভনা মীনুর কান্না শুনে মায়ের প্রতি প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মা-ও দমবার পাত্র নয়। মা-মেয়ের দ্বন্দ্বে বেআবরু হয়ে যায় পারিবারিক সম্ভ্রম।পাশাপাশি অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায়, মেসবাড়ির অন্য এক বাসিন্দা মাস্টারমশাই-এর চাকরি খোওয়া গেছে। রূঢ় বাস্তবের ঘা সহ্য করতে না পেরে তার একমাত্র মেয়ে হয়তো একটু ভালোভাবে বাঁচার আশায় বাড়ি ছেড়ে গেলে মা আত্মহত্যা করে। ছেলে দুটিকে মামার বাড়িতে রেখে

বিপন্ন মাস্টারমশাই কঠিন সময়ের মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। বিধ্বস্ত সংসারটির সাহায্যার্থে নলিনাক্ষ উচ্চমূল্যে তিন মাসের মতো খাদ্য সামগ্রী আর পোশাক ক্রয় করে শোভনাদের হাতে তুলে দেয়। ইতিমধ্যে নারীমাংসের সন্ধানে একজন 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসের' লোক শোভনার কাছে এলে শোভনা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি বটি হাতে লাফিয়ে পড়ে। সে মানতে পারে না এই ললাটলিখনকে, মানতে পারে না সমাজ তথা পরিবারের অবক্ষয়কে। তার সহজ সরল মন বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে প্রশ্ন রেখে যায়—

> 'কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?... এ যুদ্ধ আমরা বাঁধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি...।''[৪]

নলিনাক্ষ এর উত্তর দিতে না পেরে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে বেরিয়ে আসে। নিষ্ঠুর সময়ের অভিঘাতে জীর্ণ কঙ্কালসার কাঙালের মিছিল মহানগরীর রাস্তায় খাদ্যান্বেষণের বৃথা চেষ্টায় অঙ্গারের মতো নিস্তেজ হতে হতে মৃত্যুর প্রহর গোনে।

স্বাধীনতা পূর্ব ও তৎপরবর্তীকালের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, হতাশা, বেদনা, বঞ্চনা, অবক্ষয় ও জাতির বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে সমরেশ বসু 'এস্‌মাল্‌গার' (১৯৫৩) গল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগের অভিঘাতে সৃষ্ট মানব-বিপর্যয়ের সকরুণ আলেখ্যে তুলে ধরেছেন অসহায় ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তুদের জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা ও টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রামের কাহিনি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বাস্তুচ্যুত এই সর্বহারার দল শহরতলির কারখানার রাবিশের পাশে স্টেশনের ধারে নোংরা স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে আবরুহীন ছোটো ছোটো বেড়ার ঘরে কোনোমতে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করলেও পেটের আগুন নেভাতে অনেকেই জীবন বাজি রেখে সমাজের নানা আইন শৃঙ্খলাকে ভেঙে, নানা অভিশাপকে পাশ কাটিয়ে অসৎ উপায়ে জীবন নির্বাহ করে।

গল্পের শুরু আশ্বিনের শেষে হেমন্তের আগমনে। কলকাতা থেকে সামান্য উত্তরের রেলস্টেশন যেন বোবা-বদ্ধভূমি। সেখানে অন্ন সংস্থানের জন্য প্রতীক্ষারত 'আততায়ীর দল' জীবনের গ্লানি বুকে ধীরে নিঃশব্দে নিষ্পলক চেয়ে থাকে ট্রেনের সিগন্যালের অপেক্ষায়। দীর্ঘ ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে গঞ্জ থেকে চাল কিনে তারা শহরে বিক্রি করে। মরশুমের নতুন ধান ওঠেনি। রেশনের বরাদ্দ চাল ছাড়া শহরে জোগান তেমন নেই। শহরের খুচরো দোকানিরা তাই তাদের খুব খাতির করে। রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালে একে একে সকলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। বিনিদ্র রজনীর ছাপ চোখে-মুখে। এই আততায়ী দলের সর্দার গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা। বয়স তেরো কিন্তু দুঃসহ জীবনের ঘানি টানতে টানতে বুড়িয়ে গেছে। দলের অন্যান্যরা গোরার মতো একই ছাঁচে গড়া। গন্তব্যপথের আশি মাইলের প্রত্যেক স্টেশনের পুলিশের রিপোর্টে তার নাম পাওয়া যায়। বয়স কম বলে কোর্টে প্রডিউসের অযোগ্য। ইতিমধ্যে তিন বার জেলও খেটেছে। থানা-পুলিশের ভয়ে একবার চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে কোনোমতে বেঁচেছে তবুও সে থামে না। পরিবারের ছোটো ছোটো পাঁচ ভাই-বোন, বাবা-মা সকলেই তার উপর নির্ভরশীল। সামান্য মূলধনের উপার্জিত আয়ের সবটাই মায়ের হাতে তুলে দেয় সে। গোরার সহযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম সুবালা—গোরার বান্ধবী বিষ্ণুপ্রিয়া। সেও রিফিউজি, কলোনিবাসিনী। স্বামী তিন বছর ধরে নিখোঁজ। ঘরে দুই ছেলেকে রেখে নিষ্ঠুর সময়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেও জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চোরাব্যবসায় নিযুক্ত সহযাত্রীদের সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে গোরার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুই সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা গোরাকে ঘিরে মগ্ন থাকে। গোরারও সুবালার প্রতি ভালোবাসা গভীর। এই দুই অসমবয়সী নর-নারীর ভালোবাসায় জীবনের ক্লান্তি-অবসাদকে ছাপিয়ে যেন আগমনীর সুর বেজে ওঠে। যাত্রাপথের হাসি-কান্নায় দোলা খেতে খেতে তারা এগিয়ে চলে অতি সন্তর্পণে। কোথাও হয়তো ওত পেতে বসে আছে চেকার, মোবাইল কোর্ট, পুলিশ, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড আর কালকেউটের মতো সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে স্টেশনের কুলিকে দু'পয়সা ঘুষ দিয়ে এক ক্রোশ হেঁটে গঞ্জের চালের আড়তে পৌঁছায়। গঞ্জের হোটেলে চার আনার ডাল-ভাতের মহাতৃপ্তিতে ফিরে আসে। এবার তারা আরও সাবধান। পদে পদে ভয় আর উৎকণ্ঠা। প্রাণ চলে গেলেও এ মূলধনকে হাতছাড়া করা যাবে না। ইতিমধ্যে, সামনের আপ গাড়ির সঙ্গে দেখা হলে তারা খবর পায় সামনের জংশনেই মোবাইল ও সিভিল সাপ্লাই-এর গুপ্তচর বাঘের মতো অপেক্ষা করছে। অনেকেই ব্যাগসুদ্ধ লাফিয়ে পড়ে। গোরার মধ্যে প্রবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। জেলে যেতে সে ভয় পায় না—

> "কিন্তু মূলধন! ভাইবোন আর মা! তারা কি খাবে কাল? কেমন করে তাকাবে মা ওই অসহ্য অপলক দুটো চোখে।"[৫]

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলন্ত ট্রেনের নীচে আড়াল হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ধরা পড়ে। পুলিশ, মোবাইল কোর্ট, সিভিল সাপ্লাই-এর শাসানি ও আঘাতে সে ভেঙে পড়ে না —চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের নিষ্পলক চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা, অব্যক্ত বেদনার করুণ সুর।

> " 'কলকাতা ৭১' ছবিতে... তিনি বলবার কথা এবং বলবার ভাষা দুটোকেই মেলাতে পেরেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য যে কাহিনিগুলো তিনি বেছে নিয়েছেন, তার মধ্যে কোনোটাই প্রচলিত কাহিনিরীতির ধরনে তৈরি নয়। কোনোটাতেই ঘটনার উত্থান পতন নেই, নাটকীয়তার উপাদান নেই, সমস্ত অধ্যায়গুলোই যেন এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টেটমেন্ট। ছবি তৈরির রীতিতে যে বিনাটকীকরণ পদ্ধতিতে মৃণালবাবু ইদানিং অন্বিষ্ট, তার সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে গেছে কাহিনিগুলো। তাই সমাজসত্যের বলিষ্ঠ প্রকাশের কারণে তো বটেই, বক্তব্য ও শিল্পরীতির সুষ্ঠ সম্মিলনের ফলে 'কলকাতা ৭১' মৃণালবাবুর শিল্পীমানসের বিবর্তনের একটা নতুন ধাপ এবং তাঁর পরিণততম শিল্পসৃষ্টি।"[৬]

এই 'সমাজসত্যের' উন্মোচনে পরিচালক দশক থেকে দশকে বয়ে চলা দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়, মূল্যবোধহীনতা, অবক্ষয় ও তারই অনিবার্য পরিণতিতে সংগঠিত বিক্ষোভ ও বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ডাক তথা পালাবদলের নির্দেশ দিয়েছেন। বহমান সমাজব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন এই বঞ্চনা, অন্যায় ও পুঞ্জীভূত শোষণের সাক্ষী একজন কুড়ি বছরের তরতাজা যুবক। সে হাজার হাজার বছর ধরে এই দারিদ্র্য, মালিন্য, শোষণ, অন্যায়, অবিচার, মনুষ্যত্বহীনতা, মূল্যবোধহীনতা ও সমাজের অবক্ষয়কে দেখেছে। ছবির শেষ পর্যায়ে কোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে শোষণের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে তুলে ধরে শোষকের বিরুদ্ধে সুতীব্র গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। ছবির শুরুতেই নেপথ্য কণ্ঠে তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। পর্দায় লিপির আকারে মুদ্রিত এই ভাষ্য প্রতিটি পর্যায়ের শেষে মোট পাঁচবার ব্যবহৃত হয়ে প্রতিটি আখ্যানের সঙ্গে সুন্দরভাবে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছে। এই কুড়ি বছরের যুবক আসলে একটা 'concept'। সে "কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, বিমূর্ত ও কালোত্তীর্ণ এক প্রতীতি। তাই সে এক হয়েও বহু, বহুর দ্বন্দ্ব-মিলনে এক।"[৭] প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় নিষ্ঠুরতার সাক্ষরবহনকারী কুড়ি বছরের এই যুবক তুলে ধরে চিরন্তন সত্য —

> "আমার বয়স কুড়ি
> কুড়ি বছর বয়স নিয়ে
> আমি আজও হেঁটে চলেছি
> হাজার বছর ধরে
> দারিদ্র্য
> মালিন্য
> আর
> মৃত্যুর ভিড় ঠেলে
> আমি পায়ে পায়ে চলেছি
> হাজার বছর ধরে
> হাজার বছর ধরে
> দেখছি
> ইতিহাস
> দারিদ্র্যের ইতিহাস
> বঞ্চনার ইতিহাস
> শোষণের ইতিহাস"[৮]

কুড়ি বছরের যুবকটির ভাষ্য শেষ হলে মন্তাজের আশ্রয়ে পরিচালক কলকাতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এরপর কাহিনির প্রথম আখ্যানে দেখা যায় এক বিচারালয়ের দৃশ্য। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রথম সিকোয়েন্সে একটি পোশাকের দোকানের শোকেস ভাঙা ও সাহেবি পোশাক পরিহিত ম্যানিকিনকে বিবস্ত্র করার অপরাধে 'ইন্টারভিউ' চলচ্চিত্রের নায়ক আসামী

রঞ্জিত মল্লিকের বিচার হচ্ছে। সেই বিচারালয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদের পরে সমাজের নানা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধকে স্বাভাবিক 'সামাজিক অস্তিত্ব'রূপে গণ্য করা হয়। এরপর সত্তর দশকের কলকাতার একটা ঘটনাকে তিনি তুলে ধরেছেন। সংলাপহীন এই দৃশ্যে শুধুমাত্র আবহ সংগীতের মাধ্যমে এক নিষ্পাপ সহজ-সরল সুন্দরী নারীর আশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। আচমকা একটা গুলির আওয়াজ শোনা যায় এবং নেপথ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কলকাতার ময়দানে গুলিবিদ্ধ অজ্ঞাতনামা এক তরতাজা প্রাণ যুবকের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়। এরপর কাহিনি পিছিয়ে যায়। উনিশশো তেত্রিশ সালের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পের অনুসরণে কলকাতার বস্তিবাসী এক দরিদ্র পরিবারের সংগ্রাম ও বিক্ষোভকে তুলে ধরেছেন। জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে না পেরে বা নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে দুঃস্থ পরিবারের কর্তা নীলমণি কখনো স্ত্রীকে মারতে যায়, আবার কখনো অসহায় মূক প্রাণী ভুলুকে আক্রমণ করে। এর পরবর্তী পর্যায়ে এক দশক পেরিয়ে কাহিনি তেতাল্লিশ সালের কলকাতায় পৌঁছে যায়। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলকাতা শহরটা যেন মর্গে পরিণত — পথে পথে বুভুক্ষুর বুকফাটা আর্তনাদ, মৃত মানুষের মহামিছিল। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পের অনুসরণে সৃষ্ট এই আখ্যানে দেখা যায়, আকালের কবলে পড়ে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের আজন্মলালিত সংস্কার, বিশ্বাস ও আদর্শ ভেঙে পড়ে। এই আখ্যানাংশেও পরিচালক একজন ভাষ্যকারের মতো ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মানুষের অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন। জীবনের অসহনীয় পরিস্থিতিতে তাদের কৃতকর্ম বা নিষিদ্ধ জীবনযাপনের জন্য অনুশোচনা নেই বরং মনের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ অঙ্গারের মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসে। পরবর্তী পর্বে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ইতিহাস, সমাজব্যবস্থাকে তিনি চিত্রিত করেছেন। উনিশশো তিপ্পান্ন সালে প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'এস্‌মাল্‌গার' গল্প-আখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত এই অংশে বহমান সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় চোরাচালানদার একদল দারিদ্র্যগ্রস্ত কিশোরের মহাসংগ্রাম ও বিক্ষোভকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। পরিবারকে বাঁচাতে সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বে-আইনি নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের বিক্ষোভকে তুলে ধরেছে। যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত এই ক্রোধ ও বিক্ষোভ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে সত্তরের দশকে এসে। এই অংশে একাত্তরের কলকাতার বিলাসবহুল হোটেলের জমকালো পার্টিতে আগত অভিজাত সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণির মুখোশ খুলে দেন পরিচালক। সমাজের উঁচুতলায় অবস্থানকারী তথাকথিত প্রগতিশীল এই সমাজচিন্তকেরা যখন নানা রকম তাত্ত্বিক আলোচনায় বহমান সমাজব্যবস্থার নানা জটিল সমস্যার সমাধানে মশগুল তখন হঠাৎই আলো নিভে যায় এবং আবার সেই কুড়ি বছরের যুবক কোরাসের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে সকলের সামনে এই সুবিধাবাদী শ্রেণির হাজার হাজার বছরের বঞ্চনা ও শোষণের কথা সকলকে বলে এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দেয়।

আলোচ্য চলচ্চিত্রে পরিচালক একজন প্রাবন্ধিকের মতো তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জির উল্লেখ করে এক অসাধারণ শক্তিশালী আঙ্গিকে বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষের হতাশা, বেদনা, বঞ্চনা ও সংকটকে তুলে ধরেছেন। এর ফলে কাহিনি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যাত্রা করে আবার বর্তমানে ফিরে আসে এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের টুকরো টুকরো চিত্রগুলি পুনরায় ফিরে এসে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে তা বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরতে নির্বাচিত কাহিনি থেকে তিনি শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যার ফলে কাহিনিতে প্রথাগত আখ্যান বর্ণনার ঐতিহ্য, পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। কাহিনির আশ্রয় নিয়েও এই চলচ্চিত্রে তিনি প্রথাগত কাহিনি বর্ণনার রীতি পরিত্যাগ করেছেন। ফলে কাহিনিটি আগাগোড়াই এলোমেলো, ভাঙাচোরা। মৃণাল সেন বলেছেন—

> "অজিতেশের গল্প মানে ৭১-য়ের Collage-য়ের মত যেটা করা হয়েছে ওটা ঠিক গল্প নয়।... আমি যেটা বলছিলাম, এখানে তিনটে গল্প আছে ৩৩, ৪৩, আর ৫৩, কিন্তু এখানে I have tried to serve as an essayist... এবং last sequence-য়ে ১৯৭১-য়ের সেই sequence-য়ে যখন ফিরে আসছি—তখন আমি physical reality-কে redeem করতে পারিনি এবং চাইনি। redemption of physical reality-ই film-য়ের একমাত্র দায়িত্ব নয়। fragments of physical reality-কে নিয়ে আমি আমার ইচ্ছামত একটা shape দিয়েছি, আমার মানসিকতায় জমে এরকম একটা shape দিয়েছি। অর্থাৎ physical reality থেকে খুচরো উপাদান সংগ্রহ

> করেছি, টুকরো টুকরো, অনেক।... টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি ও শব্দ যোগাড় করেছি, জুড়েছি নিজের 'ইচ্ছেমতো', নিজের ইচ্ছেমতো একটা পৃথিবী তৈরী করেছি। তারপর, নিজস্ব logic আমদানি করেছি 'পৃথিবী'টাকে বাঁধতে, organise করতে, convincing করে তুলতে, বক্তব্যকে শক্ত করতে। এবং সব শেষে জেনেশুনেই, খানিকটা vengeance নিয়েও narrative style -এর tradition ভাঙতে। এই ব্যাপারটা আমি খানিকটা প্রচলিত form ভাঙার চেষ্টা থেকেও করেছি।"[৯]

সত্তর দশকের অস্থিরতা, নিজেদের সোনালী স্বপ্নকে পদাঘাত করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার তরতাজা প্রাণের কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার সকরুণ মর্মান্তিক ইতিহাসের সৃষ্টির নেপথ্যে এক রূঢ় সত্যকে পরিচালক প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রায় দু'শ বছরের রাজত্বকালে বিজাতীয় বিদেশি শাসকের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতববর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ 'colonial legacy' বা 'hangover' থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এই 'লিগাছি' থেকে উদ্ভূত বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা সমস্যাকে তুলে ধরে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নানা কমেন্টের মাধ্যমে বহমান সমাজব্যবস্থায় সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সর্বত্রই আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বার্তা দিয়েছেন 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০ খ্রি.) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। তিনি জানেন, একাত্তরের কলকাতার এই অস্থিরতা, এই প্রচণ্ডতার পেছনে নিশ্চয়ই কিছু কাজ করেছে। তা হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি। তাই একজন চিন্তাশীল সমাজনিষ্ঠ মানবতাবাদীর ভূমিকা নিয়ে অতীতের অধ্যয়ন করে বলেছেন—

> "Ours is the history of continuing poverty and exploitation running through ages."[১০]

আর তাই আলোচ্য চলচ্চিত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের ইতিহাস, এই অস্থির, ডামাডোলপূর্ণ কলকাতার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি অতীতের কাহিনি বর্ণনা করতেই করতেই আবার একাত্তরের অস্থির কলকাতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এরই মাঝে একটি ফ্যান্টাসিকে জুড়ে দেন পরিচালক। পুলিশের গুলিতে নিহত কুড়ি বছরের এক যুবকের খবর সম্প্রচারিত হয় রেডিয়োতে। একটা কাল্পনিক সুন্দরী যুবতী মেয়ের মুখের উপরে কুড়ি বছরের যুবকের কথাগুলি ভেসে ওঠে। এরপর ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালের তিনটি গল্প শেষে আবার ওই মৃত যুবকের কথাগুলি পর্দায় দেখা যায়। পরিচালক এও বলেছেন, যারা এর জন্য দায়ী, যারা নিজেদের সুবিধার্থে এই বঞ্চনা, দারিদ্র্যকে জিইয়ে রেখেছে— সেই শোষণের কারবারিদের মুখোশকে খুলে দেওয়া দরকার। তাই আলোচ্য চলচ্চিত্রের শেষ অংশে দেখা যায়, তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে তিনি সুবিধাবাদী শ্রেণির স্বরূপকে তুলে ধরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন। পর্দার আলো নিভে গেলে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত যুবক প্রকৃত সত্য সকলের সামনে তুলে ধরে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আবার ছেলেটি পর্দায় আবির্ভূত হয়ে নিপীড়িত, সর্বহারা শ্রেণির অসহায়তার কথা বলে এবং পর্দায় একের পর এক ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালের শেষ দৃশ্যগুলি ভেসে ওঠে। দশকের পর দশক জুড়ে অবহেলিত শ্রেণির ক্রোধ জমা হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। যুবকটি যেন ইতিহাস কথকের ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছে সকলের সামনে। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালে তার কী মনে হয়েছিল তা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং সংযুক্ত হতে হতে কাহিনি একাত্তরের কলকাতায় এসে পৌঁছায়। অস্থির কলকাতায় কুড়ি বছরের যুবকটি সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে অসহায় প্রাণ অকালেই ঝরে পড়ে।

চার দশকের পাঁচটি আখ্যান অবলম্বনে নির্মিত কলকাতা ট্রিলজির অন্যতম এই চলচ্চিত্র-প্রবন্ধে পরিচালক প্রথম থেকেই আখ্যান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিগত শতাব্দীর রূঢ় সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরতে তিনি একাধিক সাহিত্য আখ্যানের যেমন সাহায্য নিয়েছেন তেমনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নানা ঘটনাপঞ্জিকে তুলে ধরেছেন ভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকে। কিন্তু আখ্যান বর্ণনার চিরাচরিত ঢং-এ কাহিনি বর্ণনা করেননি। বক্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি অনুসৃত আখ্যান থেকে শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করে একজন নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্যকারের মতো প্রবন্ধের ঢঙে অতীতের সকরুণ চিত্রকে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি চাইতেন না কাহিনির রসে দর্শক মজে থাকুন, তাই কাহিনি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে এগিয়ে যায় না। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ভিন্নপথে ধাবিত হয়। বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরতে সাহিত্য আখ্যানকে নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন শিল্প মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, যুগান্তর সম্পাদনা।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., মার্চ ২০০৮, পৃ. ৫৬।
২. সান্যাল, প্রবোধকুমার। অঙ্গার। মিত্র ও ঘোষ,অগ্রহায়ণ ১৩৫০,পৃ. ৬।
৩. তদেব,পৃ. ১৪।
৪. তদেব,পৃ. ৩০।
৫. বসু, সমরেশ। আমি তোমাদেরই লোক। জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স,প্রকাশকাল অজ্ঞাত, পৃ. ৩৫২।
৬. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা। চলচ্চিত্র চর্চা (পত্রিকা)। সংখ্যা ১৮, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৩।
৭. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা। প্রসঙ্গ মৃণাল সেন: চলচ্চিত্র সমালোচনা। সংখ্যা ২৪, মে ২০১৭, পৃ. ১১৪।
৮. সেন,মৃণাল। তৃতীয় ভুবন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., আগস্ট ২০১১,পৃ. ১০৩।
৯. সেন, অনিল সম্পাদনা। চিত্রবীক্ষণ (পত্রিকা) ।সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা,এপ্রিল-মে ১৯৯৩, পৃ. ৬৮।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, যুগান্তর সম্পাদনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., মার্চ ২০০৮।
২. সান্যাল, প্রবোধকুমার। অঙ্গার। মিত্র ও ঘোষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫০।
৩. বসু, সমরেশ। আমি তোমাদেরই লোক।জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, প্রকাশকাল অজ্ঞাত।
৪. সেন, মৃণাল। তৃতীয় ভুবন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., আগস্ট ২০১১।

সহায়ক পত্রিকা:

১. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা। চলচ্চিত্র চর্চা (পত্রিকা),সংখ্যা ১৮, নভেম্বর ২০০৯।
২. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা। প্রসঙ্গ মৃণাল সেন: চলচ্চিত্র সমালোচনা। সংখ্যা ২৪, মে ২০১৭।
৩. সেন, অনিল সম্পাদনা। চিত্রবীক্ষণ (পত্রিকা) । সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা,এপ্রিল-মে ১৯৯৩।